

‘সতরঞ্জির গল্প’

অথবা

‘চুরি’

লাইলা বাল’বাক্কি

অনুবাদঃ মৌসুমী আহমেদ

আমার চুলগুলি দুই বেনী করে বাঁধা শেষ করেই মারিয়াম তার বুড়োআঙ্গুল মুখে ঢুকিয়ে ভিজিয়ে নিলো, আমার দুই ভুরু’র উপর বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, “উফ! তোর ভুরুগুলি এতো আউলা-ঝাউলা!” তারপর আমার ছোটবোনটার দিকে ফিরে বললো, “দেখতো, তোর বাবা এখনো নামাজে কিনা?” বোনটা চোখের পলকে ফিরে এলো, তারপর ফিসফিসিয়ে বললো, “এখনো পড়ছে!” আবার হাত উঠিয়ে আব্বার ভংগী নকল করে দেখিয়েও দিলো।

আমি বরাবরের মতই নির্লিপ্ত, মারিয়ামও হাসলোনা, বরং জলদি হাতে স্কার্ফটা নিজের মাথায় পেঁচিয়ে গলায় বেঁধে নিলো তারপর খুব সাবধানে আলমারীটা খুলে নিজের হ্যান্ডব্যাগটা বের করলো। ব্যাগটা বগলে চেপে ধরে সে হাত বাড়িয়ে দিলে আমরা দুবোন ওর দুটো হাত ধরলাম। এবার যে আমাদেরকে ঠিক ওর মতোই পা টিপে টিপে হাঁটতে হবে সেটা বুঝতে পারছি। রুদ্ধশ্বাসে আমরা খোলা সদর দরজাটা পার হলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় পিছন ফিরে ফিরে একবার দরজাটার দিকে, আরেকবার জানালাটার তাকাচ্ছি, শেষ ধাপের পর দৌড়াতে শুরু করলাম। যতক্ষণে সরুগলিটা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো আর আমরা সামনের রাস্তাটা পার হলাম, তার আগে আর থামলামনা। মারিয়াম একটা ট্যাক্সি থামালো।

ভয় পাচ্ছি বলেই আমাদের এমন আচরনা আমরা যাচ্ছি মা’র সাথে দেখা করতে; বাবা-মা’র ডিভোর্সের পর এই প্রথমবারের মত! যদিও আমাদের বাবা কসম খেয়েছেন, কোনোদিন আর আমাদেরকে দেখতে পাবেনা মা ! এই প্রতিজ্ঞার কারণ ছিলো ডিভোর্সের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ওই খবরটা জানাজানি হওয়া - সেই পুরোনো প্রেমিককেই বিয়ে করতে যাচ্ছে মা, পরিবারের চাপে পড়ে বাবাকে বিয়ে করতে বাধ্য হওয়ার আগে যাকে ভালোবাসতো সে !

আমার বুকের ভেতর হাতুড়ি-পেটার মতো শব্দ হচ্ছে! আমি জানি এটা বাবার ভয়েও না, দৌড়ানোর কারনেও না। মায়ের সংগে দেখা হওয়ার ব্যাপারটা নিয়েই আমার উৎকণ্ঠা হচ্ছে। বিশেষ করে, ঠিক ঐ মুহূর্তে কী করব সেটা নিয়ে আমার মধ্যে তখন যত ধরনের দ্বিধা তৈরী হবে, তা ভেবে !

আমি খুব চুপচাপ ধরনের, আর আমার এই লাজুক স্বভাবটা সম্পর্কে আমি খুব ভালভাবেই জানি। যত চেষ্টাই করিনা কেন, আবেগ প্রকাশ করতে পারিনা আমি; এমনকি মা’র কাছেও না ! ছুটে গিয়ে মা’র বুকের মধ্যে ঢুকে মাকে চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দিতে কিছুতেই পারবনা আমি। কিংবা মা’র মুখটাকে দুহাতে ধরে তাকিয়ে থাকতে, আমার ছোট বোনটা যেটা করবে - ওর পক্ষে এটাই স্বাভাবিক।

লম্বাসময় ধরে আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছি। যে মুহূর্তে মারিয়াম আমাদের দুবোনের কানে ফিসফিসিয়ে খবরটা দিয়েছিলো, মা শহরে ফিরে এসেছে আর আমরা পরদিনই তার সাথে দেখা করতে যাচ্ছি, তার পর থেকেই।

প্রথমে ভাবলাম জোর করে হলেও ঠিক আমার বোনের মতোই আচরণ করবো আমি; ও কী করে দেখবো, তারপর চোখবন্ধ করে ওকে নকল করবো। অথচ খুব ভালো করেই চিনি আমি নিজেকে ! আসলে যত চেষ্টাই করিনা কেন, আগে থেকে যত কিছুই ভেবে রাখিনা কেন, সময়মতো আমি ঠিকই সেসব ভুলে গিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবো - ঝু-কৌচকানো শব্দ একটা মুখ নিয়ে। অবশ্য এরপরও হাল ছাড়বনা আমি, ঠোঁট দুটোকে মিনতি করবো অন্তত একটু হাসি যাতে ফুটে ওঠে; কিন্তু কিসসু লাভ হবেনা তাতে !

আমাদের গাড়িটা একটা বাড়ীর সদর দরজায় এসে থেমেছে যেটার দু’পাশে দু’টো কলামের মাথায় স্যান্ডস্টোনের সিংহ মূর্তি! মনের মধ্যে একটা খুশির ঢেউ উঠছে, মুহূর্তের জন্য আমার ভয় আর লজ্জার কথা ভুলে গেলাম। খুব মজা লাগছে যে দরজার দুদিকে দুটো সিংহ—ওয়ালা একটা বাড়িতে মা এখন থাকে! আমার বোনটা মুখ দিয়ে সিংহের মতো আওয়াজ করছে হিংসে হয় ওকে - তাকিয়ে দেখি হাত উঁচিয়ে সিংহটাকে ধরা চেষ্টা করছে ও! কতো সরল আর সুখী! ভীষণ বিপদেও আনন্দের কমতি হয়না ওরা এই এখনই দেখনা, মায়ের সাথে দেখা হওয়ার এই ব্যাপারটা নিয়ে একবিন্দুও বিচলিত না সে!

মা দরজাটা খুললো। আমি আর ধরে রাখতে পারলামনা নিজেকে! ছুটে গিয়ে সবার আগেই মায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম। চোখ বন্ধ করে মনে হচ্ছে যেন কতদিনের রাতজাগা আমার পুরো শরীরের সমস্ত অন্ধি-সন্ধি এক নিমেষে ঘুমিয়ে পড়লো। মা’র চুলের চিরচেনা গন্ধটা নিতে নিতে প্রথমবারের মতো আবিষ্কার

করলাম এতদিন কতটা মিস করেছি তাকে। খুব মনে হচ্ছে মা ফিরে আসুক, আবার আমাদের সাথে থাকুক। যদিও বাবা আর মারিয়ামের কাছে যথেষ্ট আদর-যত্নেই আছি আমরা, তবুও।

ভাবতে ভাবতেই আবার মনে পড়ে যাচ্ছে মায়ের মুখের সেদিনের সেই হাসিটা, যেদিন ডিভোর্স দিতে রাজি হলো বাবা। মা বলে দিয়েছিলো, ডিভোর্স না পেলে গায়ে পেট্রোল ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করবে! তাই শেষপর্যন্ত একজন মৌলানার হস্তক্ষেপে ব্যাপারটার সুরাহা করতে হয়েছিলো।

মা'র গায়ের গন্ধে কেমন ঘোর লেগে যাচ্ছে, আমার খুব চেনা গন্ধটা! মা'র না থাকটা যে আমাকে কতটা বিমর্ষ করে রেখেছিলো এতদিন, এখন তা বুঝতে পারছি। অথচ যেদিন কেঁদে কেঁদে আমাদের চুমু দিতে দিতে বিদায় নিলো মা, তাড়াহুড়ো করে আমার পিছন পিছন হেঁটে গাড়ীতে উঠে বসলো - আমরা কিন্তু সংগে সংগেই আমাদের সরুগুলির নিত্যদিনের খেলায় ফিরে গিয়েছিলাম! সেদিন রাতে, বহুদিন পর, বাবা-মার ঝগড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছিলোনা। যে নিস্তর্রতাটা ছেয়েছিলো বাড়িটায়ে সে-রাতে, শুধু মারিয়ামের ফোঁপানির আওয়াজই তার কিছুটা ব্যত্যয় ঘটচ্ছিলো। বাবার দিকের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় মারিয়াম; যতদূর মনে পড়ে, ও আমাদের বাড়ীতেই সবসময় থেকেছে।

হাসতে হাসতে মা আমাকে পাশে সরিয়ে দিয়ে ছোটো বোনটাকে আদর করলো; তারপর মারিয়াম কে কাঁদতে দেখে আবার ওকে জড়িয়ে ধরলো। আমি শুনছি, মা বলছে, “তোর শ্বশুর কোনোদিন শোধ করতে পারবেনা”, তারপর জামার হাতায়ে চোখ মুছে নিয়ে একবার বোনের দিকে তারপর আমার দিকে দেখে নিয়ে বলল, “মাশাআল্লাহ, শয়তানের নজর না লাগে! কত বড় হয়ে গেছিস তোরা!”

মা আমাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরলো আর মা'র কোমর জড়িয়ে ধরলো আমার বোন, তারপর ওইভাবে হাঁটতে গিয়ে আমরা দেখলাম যে পারা যাচ্ছেনা, তখন সবাই মিলে হেসে উঠলাম। ভিতরের ঘরে ঢুকে আমার এমন একটা অনুভূতি হলো যে নিশ্চয়ই মায়ের নতুন স্বামী ঘরেই আছেন। ততক্ষণে মা বলতে শুরু করেছে, “মাহমুদ তোমাদেরকে খুব পছন্দ করে, সে চায় তোমাদের বাবা যেন তোমাদেরকে আমাদের সাথে থাকতে দেয়; যাতে তোমরা ওরও মেয়ে হতে পারা” বোনটা হেসে উঠে বলে ফেললো, “তারমানে আমাদের দুইটা বাবা থাকবে?”

আমি এখনও ঘোরের মধ্যেই - হাত বাড়িয়ে মা'র হাতটা ধরলাম। নিজের উপর খুশী হয়ে উঠেছি; কত অনায়াসেই না আমার কুণ্ঠিত মুষ্টিবদ্ধ হাতগুলো দ্বিধাহীন হতে পারলো আর লজ্জা- সংশয়ের বন্দীত্ব থেকে আমি মুক্তি পেলাম! একটু আগের ঘটে যাওয়া মুহূর্তটা মনের মধ্যে ফিরিয়ে আনলাম, কেমন অনায়াস উচ্ছাসে মায়ের বুকো কাঁপিয়ে পড়েছিলাম - কখনো যা আমার পক্ষে সম্ভব হবে ভাবিনি - এতো গভীর ভাবে চুমু খেয়েছিলাম মা'কে যে আবেগে আমার চোখ মুদে এসেছিলো।

মা'র নতুন স্বামী ঘরে নেই, তবে মেঝের দিকে তাকিয়েই আমি শক্ত হয়ে গেলাম! কিছুই বুঝতে পারছিনা! মেঝেতে বিছানো ইরানী কার্পেটটার দিকে একবার তাকিয়েই মা'র দিকে একটা দীর্ঘ ইঙ্গিতপূর্ণ দৃষ্টি দিলাম। কিন্তু মা সেটা বুঝলোনা, বরং আলমারীটার কাছে গিয়ে কপাট খুলে ভেতর থেকে একটা নকশা করা জামা বের করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলো, তারপর ড্রেসিং টেবিলটার ড্রয়ার খুলে লাল লাল ছোটো ছোট হাট আঁকা একটা হাতির দাঁতের চিরুনি বের করে বোনকে দিলো।

আমি কার্পেটটার দিকেই তাকিয়ে তাকিয়ে রাগে আর বিরক্তিতে কাঁপছি। আবারও মা'র দিকে তাকালাম, কিন্তু সে দৃষ্টির ভাষা বুঝতে মা ভুল করছে, ভাবছে সে চাউনিতে মা'র জন্য টান আর ব্যাকুলতা - জড়িয়ে ধরে বলছে, “এরপর থেকে একদিন পরপরই তোরা আসবি, আর প্রত্যেক শুক্রবার অবশ্যই আমাদের সঙ্গে কাটাবি”

আমি এখনো স্তম্ভিত! মা'র হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিতে ইচ্ছা করছে। ফরসা হাতটাতে দাঁত বসিয়ে দেব নাকি? আমার ইচ্ছা করছে, পিছিয়ে গিয়ে ঠিক দেখা হওয়ার প্রথম মুহূর্তটাকে ফিরিয়ে আনি; তাহলে মা দরজা খোলার পর মেঝের দিকে ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম, ঠিক যেটা করা আমার পক্ষে স্বাভাবিক হতো!

আমি ঐ কার্পেটটা থেকে চোখ সরাতে পারছিলাম। ওটার নকশার প্রতিটা রেখা, প্রত্যেকটা রঙ আমার খুব চেনা! ওই কার্পেটের উপর শুয়ে শুয়ে আমি স্কুলের হোম-ওয়ার্ক করতাম আর মনোযোগ দিয়ে নকশাগুলো খেয়াল করতাম। খুব কাছ থেকে দেখলে মনে হতো, অনেক গুলো লাল লাল তরমুজের টুকরো সাজানো; আর সোফার উপর থেকে দেখলে টুকরোগুলোকে মিহি দাঁতের চিরুনির মতো লাগতো! চার কোণায় চারটা বড়বড় ফুলের ঝাড়, লালচে বেগুনি রঙের, দেখতে অনেকটা মোরগফুলের মতো। প্রত্যেক গ্রীষ্মের শুরুতে অন্যান্য সবগুলোর সাথে এই কার্পেটটাকেও মা ন্যাপথলিনের বল দিয়ে দিয়ে গুটিয়ে আলমারির মাথায় তুলে রাখত। তখন কার্পেটটা ছাড়া ঘরটাকে কেমন মলিন আর বিষন্ন লাগত। তারপর হেমন্ত এলে ওগুলোকে ছাদে বিছিয়ে দিতো। ন্যাপথলিনের বলগুলো বেশিরভাগই গরমকালের আর্দ্রতা আর তাপে গলে ছোট ছোট হয়ে যেত। যেগুলো তখনও রয়ে যেত, সেগুলো তুলে ফেলে ছোট একটা ব্রাশ দিয়ে কার্পেটটাকে ঝেড়ে ছাদে ফেলে রাখতো মা। সন্ধ্যার দিকে ওটাকে নীচে নামিয়ে এনে আবার মেঝেতে বিছিয়ে দিলে খুশীতে আমার মনটা

ভরে যেতা কার্পেটের উজ্জ্বল রঙে ঘরটা যেন আবার প্রাণ ফিরে পোত! কিন্তু ডিভোর্সের কয়েকমাস আগে, ছাদে রোদে দেওয়ার পর থেকে কার্পেটটাকে আর পাওয়া যায়নি।

বিকালে ঘরে নিয়ে আসার জন্য ছাদে গিয়ে ওটাকে দেখতে না পেয়ে বাবাকে ডেকেছিল মা! সেই প্রথমবারের মতো বাবার মুখটাকে রাগে লাল হয়ে যেতে দেখেছিলাম! দু'জনে ছাদ থেকে যখন নেমে এসেছিলো, মা'কে খুব অস্থির আর ক্রুদ্ধ দেখাচ্ছিলো। প্রতিবেশীদের ডেকে ডেকে মা জিজ্ঞেস করেছিলো তারা কার্পেটটা দেখেছে কিনা! সবাই অস্বীকার করেছিলো। তখনই মা আচমকা চিৎকার করে বলে উঠেছিলো, “ইলিয়া!”

আমরা সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম – বাবা, আমি, বোন, প্রতিবেশীরা, সবাই! “তুমি কেমন করে বলতে পারলে মা? এটা হতেই পারেনা!” আমি চিৎকার করে বলেছিলাম!

ইলিয়া ছিল প্রায় অন্ধ। আমাদের পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরে সে বেতের চেয়ার মেরামত করতো। আমাদের বাড়িতে যখন কাজ করত, তখন স্কুল থেকে ফিরে আমি দেখতাম পাথরের বেঞ্চটাতে সে বসে আছে, সামনে এক স্তূপ খড়া রোদে তার মাথার চুল গুলো চকচক করত, হাতের টানে সে বেতিগুলো দিয়ে বুননের কাজটা এমন একটা মসৃণ ছন্দে করে যেত যে দেখে মনে হত মাছ ধরার জাল থেকে ছাড়া পাওয়া মাছেদের লাফালাফি দেখছি! আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, কেমন করে সে একটা ফুটোর মধ্য দিয়ে বেতীটা দ্রুত আর দক্ষতার সাথে ঢুকিয়ে দিতো, তারপর অন্য আরেকটার চারপাশ দিয়ে ঘুরিয়ে পৌঁচিয়ে আবার বের করে আনতো যতক্ষণ না একটা নিখুঁত বৃত্ত তৈরী হয়, ঠিক এর আগের বৃত্তটার মতো! সবকটা বৃত্ত ঠিক এক মাপের, একই ডিজাইনের, হাত তো নয়, যেন মেশিন! তার আঙুলের পারদর্শিতা আর ক্ষিপ্ৰতা দেখে আমি মুগ্ধ হতাম! এমনকি তার ভঙ্গীটাও – মাথাটা ঝুঁকিয়ে সে এমন ভাবে বসতো, মনে হতো যেন সে চোখ দিয়ে দেখেই কাজটা করছে। একবার আমার সন্দেহ হয়েছিল যে সে কি সত্যিই কালো কালো ছায়া ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না? তাই একদিন আমাকে দেখা গেল, সামনের মাটিতে হাটু মুড়ে বসে ওর লালচে গোলাপি মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকতো চশমার ভিতরে ওর ঝাপসা ঘোলাটে চোখ দুটো সেদিন দেখেছিলাম আর ও দুটোর ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া সাদা একটা রেখা, যেন আমার হৃৎপিণ্ডটা ফুঁড়ে দিয়েছিল! তাড়াতাড়ি করে রান্নাঘরে ঢুকে টেবিলের উপর এক ব্যাগ খেজুর দেখতে পেয়ে একটা প্লেটে এক খাবলা তুলে নিয়ে ওকে দিয়েছিলাম।

কার্পেটটার দিকে এখনও আমি একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি, আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে ইলিয়ার সেই লাল চুল আর লালচে মুখ। দেখতে পাচ্ছি ওর হাত, একা একা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতো যেভাবে, তারপর ওর চেয়ারটাতে বসে যেভাবে দরকষাকষি করতো। যেভাবে সে প্লেটের সবটুকু খাবার শেষ হয়েছে নিশ্চিত হয়েই খাওয়া শেষ করত, তারপর সরাসরি জগ থেকে পানি খেত আর পানির স্রোত মসৃণভাবে ওর গলা বেয়ে নেমে যেত। সেবার দুপুরবেলা নিয়ম মত দরজায় টোকা দিয়ে বাড়িতে ঢোকান আগেই যখন ‘আল্লাহ’ বলে হাঁক দিলো ইলিয়া, (এই নিয়মটা বাবার কথা মতই সে মেনে চলত যাতে অপ্রস্তুত অবস্থায় মা'কে সে দেখে না ফেলে) মা দৌড়ে গিয়েছিলো তাকে কার্পেটের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে! ও কিছুই বলেনি, শুধু কান্নার মতো একটা শব্দ করেছিল। চলে যাওয়ার পথে সেই প্রথমবারের মতো হৌচট খেয়ে আরেকটু হলেই টেবিলটার সাথে ধাক্কা খেতে যাচ্ছিলো। আমি তাড়াতাড়ি কাছে গিয়ে তার হাতটা ধরেছিলাম। আমার হাতের স্পর্শ সে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছিল, প্রায় ফিসফিস করে বলে ছিলো, “কিছু হয়নি, খুকী!” চলে যাওয়ার জন্য ঘুরে দাড়িয়েছিলো তারপরা জুতো পরার জন্য যখন নীচে ঝুঁকেছিল, আমার মনে হয়েছিলো ওর গালটা ভেজা। বাবা ওকে বলেছিলো, “তুমি সত্য কথা বললে খোদা তোমাকে মাফ করবেন, ইলিয়া!” কিন্তু ইলিয়া চলে গেলো। সিঁড়ির রেলিং ধরে ধরে সে নিজেই সামলাচ্ছিলো; নামার সময় ধাপগুলো বুঝে নিতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় নিচ্ছিল সে। শেষে একেবারে দৃষ্টির বাইরে চলে গেলো, আর কখনো দেখিনি আমরা ওকে।